অতুলপ্রসাদ

সুনীলময় ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

অবতরণিকা

উনিশ শতকের বাংলা। নব-জাগরণের বাংলা। দীর্ঘদিনের অভ্যাস-জাত সংস্কারের প্রবাহকে নতুন চিন্তায় ও ভাবনায় শুদ্ধ করার কাজে বাংলার মানুষ ব্রতী হয়েছেন। প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকৃতির নতুন নতুন পথের সন্ধান, জীবন সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ও আশায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। ধর্মকেন্দ্রিক জীবন-আদর্শের নতুন ধারায় জাগরণের প্রভাব অত্যন্ত গভীরভাবে বাংলার ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে রূপ পেতে লাগল দ্রুত। পুরোনো মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। ভারতচন্দ্র থেকে রামপ্রসাদ—এদের জীবনবোধ ছিল পুরোনো ধ্যান-ধারণার অনুসারী— কিন্তু নব-জাগরণের মূল কথা হল, 'বৈরাগ্য সাধনে মুতি সে আমার নয়'।

রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজের কোম্পানির শাসন প্রথমদিকে বাঙালির কাছে ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধার। মোগল রাজত্বের অরাজকতার গ্লানি থেকে বাংলাকে তথা ভারতকে রক্ষা করেছিল ইংরেজ শাসন।

তাই বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ ইংরেজকে বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছিল। ইংরেজ বিদেশি হলেও শত্রু নয়। এই মানসিকতায় ইংরেজের ভাব-চেতনার উৎসারিত আলোকত আনন্দ-বেদনা বেশ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সমাজকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কখনো কখনো বিদেশির অধীনতার বেদনায় ইংরেজের প্রতি জাগত বিরূপ মনোভাব।

পলাশির যুদ্ধ থেকে সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর পরে ইংরেজের পরিচয়ে ধীরে ধীরে বাঙালির অনুভবে শ্রদ্ধার বাতাবরণে 'কালোমেঘ' জমতে শুরু করল। সামরিক শক্তি, অর্থশক্তি, তথা বণিকবৃত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ইংরেজ ভারতবাসীর ওপর আধিপত্য স্থাপনের বীজ বপন করতে লাগল। ক্রমে স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরাচারী মানসিকতার ইংরেজের 'শাসন যন্ত্র' প্রবলতর হতে লাগল। বহির্বিশ্বের নানা রাজনৈতিক ঘটনায় ইংরেজের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় বাঙালির চেতনায় বারেবারে আঘাত এল। মিশনারি পাদরিদের ক্রিয়াকলাপ, তথা তাদের হিন্দুধর্মের অসারতাকে প্রচার করার নির্লজ্জ দৃষ্টান্তে বাঙালির মণীষা এবার আপন শক্তি ও অস্তিত্বের প্রশ্নে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হল।

এ কাজে রাজা রামমোহন রায় এগিয়ে এলেন সর্বপ্রথম।

রাজা রামমোহন রায়ের কলকাতায় আগমন থেকেই বাংলার নব-জাগৃতির সূচনা ধরা হয়। এই নব উন্মেষের কালকে তুলনা করা হয় চতুর্থ খ্রিস্ট শতকের ইতালীয় নবজাগরণের (Renaissance) বা 'রেনেসাঁ'র সঙ্গে যদিও এই তুলনা অতর্কিত নয়। ইতালীয় নবজাগরণে পুরাতনের নব-উন্মোচন ঘটেছিল। খ্রিস্টানি গোঁড়ামির প্রতিবাদে প্রাচীন গ্রিক রোমান ঐতিহ্যের ধারা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিলন সাধন। শুরু করে ছিলেন রামমোহন।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিচার শুরু করেছিলেন নতুন আলোকপাতে। ফলে একটা বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরি হয়। পুরোনো কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ শুরু হয়। প্রবলতা পায় বদ্ধমূল মিথ্যা সংস্কার নয়, নতুন যুক্তিবাদ ও নব-মানবতার আদর্শ। এই ধারায় আগে অনেকে এলেন। এলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। আবির্ভাব ঘটল শ্রী মধুসূদনের। হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিত সমাজও সমাজ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। অনেকেই ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও-র।

রামমোহনের আদর্শে এগিয়ে এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মসমাজ। প্রকাশিত হতে লাগল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এর কিছু পরেই এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নিয়ে এলেন বঙ্গদর্শন। এইভাবে বাংলার সমাজ জীবন ও মানসিকতা নবগঠিত হচ্ছিল।

ইংরেজি শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার ব্যাপক বিপুল আয়োজনের ভোজ বাংলার নবীন যুবকদের আকর্ষণ করেছিল অনবরত। সেই থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সর্বত্র। পুরোনো, জীর্ণতার জাল ছিন্ন করে নতুন নতুন ভাব ও আদর্শের ঢেউ বইতে লাগল। আধুনিক মানসিকতায় দীর্ঘদিনের চর্চিত ভাবনা ও চিন্তার পরিবর্তন হতে লাগল। ধাপে-ধাপে মনীষী ব্যক্তিগণের প্রভাব সমাজ-জীবনে গভীর আলোড়নের ঝড় তুলে নব-মূল্যায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নিয়ে বিক্ষোভ দানা বাঁধল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন অনুসন্ধানে যুক্ত করল নবীন প্রজন্মকে। ধর্মে-সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে বিবর্তনবাদের তীব্র প্রভাব মানুষকে নতুন ভাবে ভাবতে শক্তি দিল। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যে পুরোনো সংস্কার ভেঙে রাবণ মেঘনাদকে গড়লেন হোমারের ইলিঅদ' কাব্যের আদলে। মেঘনাদের মৃত্যু কাহিনিতে ফোটালেন দেশের জন্য আত্মদানে গৌরবের আদর্শ। হেমচন্দ্রের 'বৃত্তসংহার' কাব্যেও

সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। রামলাল ও 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে দেশাত্মবোধের মহিমা গাইলেন। ওদিকে নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে দিতে চাইলেন মহাভারতের নতুন ব্যাখ্যা। দেখালেন শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের উত্তুঙ্গ মানবিক আদর্শের স্বরূপ।

এলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যক্ষতার সম্মুখীন হয়ে জীবনের আদর্শকে কর্মে রূপ দেবার ঘোষণা করলেন। নিছক গল্প-কাহিনি নয়, কাহিনির মায়াজালে সাধারণ মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তুললেন নবযুগের আদর্শ—। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন 'আনন্দমঠ'। —মা ও মাটি একমাত্র আরাধ্য রূপে ঘোষিত হয়— দেশের কাজে তাঁর কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র গান, একমাত্র ধ্যান, একমাত্র মন্ত্র—'বন্দেমাতরম্'।

কাতারে কাতারে, তরুণ-প্রাণে ঝড় উঠল—জেগে উঠল নব চেতনা—ভয় নয়, দ্বিধা নয়, এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত। সব সংশয় পায়ের তলায় পিষ্ট করে শুধু চলা আর চলা—এই বোধে উল্লসিত হল দেশ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এলেন, এলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা বাংলার মাটি থেকে উৎসারিত আদর্শবোধকে ছড়িয়ে দিলেন ভারতের সর্বত্র—জাগরণের শঙ্খ বাজিয়ে ঘুম থেকে তুললেন মোহগ্রস্ত সংকীর্ণতায় নেশাগ্রস্ত যুবকদের। শোনালেন 'বন্দেমাতরম্'-এর সেই অমৃতবাণী। প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি—জাতীয় সংগ্রামের পবিত্র বীজ উপ্ত হল। ধর্মবিরোধ, জাতিবিরোধ, উদার চৈতন্যবোধে দেশানুগত্যের উচ্ছল উদ্দাম প্রবাহে ধুয়ে মুছে গেল।

করুণা ও মৈত্রীর প্রত্যক্ষ অবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীর উপলব্ধ সত্যের বিচ্ছুরিত আলো তখন আলোকিত বাংলার পথঘাট। নবীন যুবকদের অন্তর জেগে উঠছে সেই আলোয়।

পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের ভোগবাদকে গ্রহণ না করার জন্য দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর নতুন পথ দেখালেন, বললেন ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগেই জীবনের মূল প্রবাহ। আপন জীবনের কঠিনতম তপস্যায় তিনি মৃন্ময় মূর্তির মধ্যে চিন্ময় সাধনার সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন এবং দ্বিধাহীনভাবে প্রচার করলেন —'যত মত তত পথ'। সব বন্ধন খসে যায়—ধর্মের সংকীর্ণতার বেড়া আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে থাকে। বাংলার জিজ্ঞাসু দামাল যুবকেরা ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আপন আপন প্রশ্নের সমাধান জেনে নিতে চায়। এমনি পরিচ্ছন্ন এক মানসিকতায় নারী- পুরুষের মেলামেশার গণ্ডিও সরে যায়। সভা-সমিতিতে স্ত্রীজাতীর প্রবেশ ক্রমে অবাধ হল। বিদ্যাচর্চাও সাবলীল গতিতে সকলের মধ্যে প্রকাশিত হল। এইভাবে বাঙালির জীবনে নব প্রবর্তনায় নবযুগ আসে।

এক

উনিশ শতকের সেই নবজাগরণের আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে যেসব নবজাত জন্মেছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরল প্রতিভা বানদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেনও একজন।

বঙ্গাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ঐতিহ্যে পুষ্ট নবাবি সংস্কৃতির দীপ্তিতে উজ্জ্বল বহু অনামি পীর-মহাপুরুষের পদরজে ধন্য ইংরেজের প্রিয় স্থান ছিল ঢাকা। সর্বধর্মের প্রত্যক্ষ অভিসার সেখানে। মহরম আর জন্মাষ্টমীর মিছিল এই ঢাকার ঐতিহ্য। ঢাকার ভাটপাড়ার বাসিন্দা ব্রাহ্ম-ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে কন্যা হেমন্তশশীর প্রথম সন্তান অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। সেদিন ছিল ২০ অক্টোবর ১৮৭১ সন। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত এবং মাতামহী অন্নদাদেবীর প্রথম দৌহিত্র এই নবজাতকের জন্মকে পরম করুণাময় ভগবানের আশীর্বাদরূপে পেয়ে তারা জাতকের নাম দিয়েছিলেন 'অতুলপ্রসাদ'।

অতুলপ্রসাদের পিতা ডা. রামপ্রসাদ সেন এবং মাতা হেমন্তশশী। বঙ্গদেশের (অধুনা বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর পরগনার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের 'মগর' গ্রামে রামলোচন সেন ও কৃষ্ণচন্দ্র সেন বাস করতেন। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না—কিন্তু সত্য-নিষ্ঠজীবনচর্চায় গ্রামের মানুষের কাছে তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত গভীর। গ্রামের মানুষ নানা ব্যাপারে তাঁদের ওপর ছিল নির্ভরশীল।

'মগর' গ্রামের উন্নতি ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র ভাবনা। তখনকার দিনে 'মগর' গ্রামকে 'পঞ্চপল্লী' ডাকঘরের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগেই।

কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণভাবে কবিরাজি পেশায় দিনাতিপাত করতেন। দরিদ্র কিন্তু সৎ মানসিকতায় ব্যক্তিগত জীবনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র এবং দুই কন্যা। তাঁরা হলেন—দুর্গাপ্রসাদ, উমাতারা, গুরুপ্রসাদ এবং ভবসুন্দরী ও রামপ্রসাদ। বড়ো ছেলে দুর্গাপ্রসাদ অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় সন্তান উমাতারা এবং চতুর্থ সন্তান ভবসুন্দরী—কৃষ্ণচন্দ্র এই দুই কন্যার বিবাহ খুব অল্প বয়সে দিয়েছিলেন। আর্থিক অব্যবস্থাজনিত কারণে কৃষ্ণচন্দ্র চতুর্থ সন্তান পুত্র গুরুপ্রসাদকে ভবসুন্দরীর স্বামীর আলয়ে এবং পঞ্চম সন্তান পুত্র রামপ্রসাদকে উমাতারার স্বামীর আলয়ে রেখে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ বিষয়ে দুই কন্যা উমাতারা ও ভবসুন্দরীর উদ্যোগেই বাধ্য করেছিল পিতা কৃষ্ণচন্দ্রকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে।

যথাসময়ে গুরুপ্রসাদ শিক্ষাশেষে নিজ গ্রামে পিতার কাছে চলে আসেন আর রামপ্রসাদ বড়ো বোন উমাতারার কাছে থেকে বাংলাভাষার সঙ্গে ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে নিকটবর্তী জপ্‌সা গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। শিক্ষকতার

কাজে উৎসাহ থাকলেও রামপ্রসাদের ছিল উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা। প্রতিদিনই একলা বসে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। পরিশ্রমী এবং সৎ, সর্বোপরি ধর্মপ্রাণ রামপ্রসাদ ভবিষ্যৎ জীবনের উচ্চ-আশায় একদা গ্রাম ছাড়লেন। হাতে কোনো অর্থ-সম্বল ছিল না—পায়ে হেঁটে, কখনও বা পথের লোকদের অনুরোধ করে মিলে যাওয়া কোনো যানে চলেছেন। কিন্তু ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত রামপ্রসাদ এগিয়ে যাবার সংকল্প ত্যাগ করতে পারলেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে অসহায় নিঃস্ব অবস্থায় কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন।

কলকাতা তখন ব্রাহ্ম-নেতাদের রমরমা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ঋষিতুল্য মনীষীদের উপস্থিতি। রামপ্রসাদ আগেই তাঁদের কথা জেনেছিলেন। একদিন নিজেই সাহস করে চিৎপুরের ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। সহায়হীন নিঃস্ব পূর্ববঙ্গীয় যুবক রামপ্রসাদকে দেখামাত্র মহর্ষির করুণা হল। কাছে টেনে নিলেন। নানা খোঁজ খবর নিলেন। রামপ্রসাদের সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ত ও তেজদীপ্ত মানসিকতার পরিচয় তাঁর কথাবার্তায় এমনভাবে ফুটে উঠেছিল যে, মহর্ষি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং যুবক রামপ্রসাদকে উন্নতির লক্ষ্যে সহযোগিতা করার কথা বলেন। এরপর রামপ্রসাদ মহর্ষির আনুকূল্যে মেডিকেল কলেজে বাংলা ক্লাসে ভরতি হন। সে সময় বাংলায় ডাক্তারি পঠনপাঠন হত।

অভাবনীয় পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় রামপ্রসাদ ভালোভাবে ডাক্তারি পাস করলেন এবং প্রথমে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করে ঢাকায় এলেন—সেখানে তিনি ছিলেন পাগলা গারদ দেখাশোনার দায়িত্বে।

এদিকে ব্রাহ্ম-নেতাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের মেলামেশা বেশ ভালোভাবেই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্ম-নেতাদের ত্যাগ-ভাবনা, ঈশ্বর-নির্ভরতা এবং বিশ্বাসের গভীরতা, রামপ্রসাদকে গভীরভাবে

আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া মহর্ষির জীবন-যাত্রার আদর্শও রামপ্রসাদকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন যখন ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে ও প্রচারে ঢাকায় আসেন তখনই রামপ্রসাদ দীক্ষিত হন ব্রাহ্মধর্মে।

সে সময় ব্রাহ্মদের সাধারণ বাঙালি সমাজে অচ্ছুত বলে মনে করা হত। তাই রামপ্রসাদ ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হবার অব্যবহিত পরেই ঢাকা শহরের সামাজিক জীবনধারা থেকে সমাজচ্যুত হয়ে পড়লেন এবং সেভাবেই অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে পরম করুণাময়ের ওপর নির্ভরতাকে বজায় রেখে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

ঢাকার ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী। তাঁর কন্যা হেমন্তশশী ছিলেন গুণবতী, সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না। পরম করুণাময় দয়াল ঈশ্বর- নির্ভরতাই হেমন্তশশীর জীবন-কর্মকে পরিচালিত করত নিরবধি। তিনি এই বিশ্বাসে সমাজের সকল রকম প্রতিকূলতাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে সকলের সেবা করতে চাইতেন। সহনশীলতা তাঁর প্রতিটি ব্যবহারে ও ভাবনায় মধুরিমা দান করত। মাঝে মাঝে হেমন্তশশী একান্তভাবে কাব্যচর্চাও করতেন। গান ও সূচি-শিল্পেও তাঁর অনুরাগ ছিল।

রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা এই হেমন্তশশীকে বিবাহ করেন।

রামপ্রসাদ প্রথমাবধি স্বাধীনচেতা, মেধাবী এবং সৎ। পাগলা গারদের সরকারি গোলামি করতে তাঁর মন চাইত না। বিবাহের ঠিক পরেই রামপ্রসাদ স্ত্রী হেমন্তশশীর সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন, এবং হাসনাবাজারে মিডকোর্ড হাসপাতালের বিপরীত দিকে মিরাতারের একটি ভাড়া বাড়িতে 'নিউ মেডিকেল হল' নামে একটি ডিসপেনসারি খোলেন। ঢাকার এই 'ডিসপেনসারি' দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যে সকলের নির্ভরস্থল হয়ে উঠল। এত বড়ো ঔষধের দোকান তখন ঢাকায় আর একটিও ছিল না।

ডাক্তার হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই রামপ্রসাদের নাম ও যশ প্রসারিত হয়।

অন্যদিকে রামপ্রসাদ সুবক্তা; সামাজিক তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ও সভাসমিতিতে তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন। বাড়িতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে অবসর সময়ে, সংগীত চর্চা করতেন। গান রচনায় ও সুর সংযোজনেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ঢাকার রাস্তায় প্রচারিত হোলির অনেক গান তিনি নিজে রচনা করেছিলেন। বাড়ির মধ্যে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন ধরনের ফুলগাছের পরিচর্যাতেও তাঁর আনন্দ ছিল।

চিকিৎসা-ব্যবসায় রামপ্রসাদ সেন স্বচ্ছল ছিলেন। সংসারের অনিবার্য ব্যয় নির্বাহ করে গুণবতী স্ত্রী হেমন্তশশীর উদ্যোগে উদ্বৃত্ত অর্থে নিজের গ্রামে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন।